ISBN 978-93-82112-80-8

ষষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক বক্তৃতা ২০২১

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ঃ কতদিন, কতদূর

পবিত্র সরকার

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ষষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক বক্তৃতা ২০২১

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা : কতদিন, কতদূর

পবিত্র সরকার

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

'Matribhasar Madhyame Sikkha : Katodin, Katodur'
Sixth Rabindranath Tagore Memorial Lecture 2021 *by* Pabitra Sarkar

ষষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক বক্তৃতা ২০২১
২৯ জুন, ২০২১

প্রথম প্রকাশ
নভেম্বর, ২০২১

© নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশক ঃ নিবন্ধক, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
Published by the Registrar, Netaji Subhas Open University

সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মুদ্রক
গীতা প্রিন্টার্স, ৫১এ, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা - ৭০০ ০০৯

মূল্য ঃ ৫০ টাকা

মুখবন্ধ

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ষষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক বক্তৃতার মুদ্রিত বয়ান প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আজ এই উপলক্ষে মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা অগণিত সহকর্মী, শিক্ষার্থী ও সুধীজনকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই দশকের পথ চলায় আপনারা নিরন্তর জড়িয়ে থেকেছেন, অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচিতিকে সর্বভারতীয় স্তরে উন্নীত করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম আজ জাতীয় স্তরে ন্যাক 'A- Grade' মূল্যায়নের মাধ্যমে স্বীকৃত হয়েছে।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-ভাবনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জনপরিসরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক বক্তৃতার ষষ্ঠ পর্যায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২৯জুন, ২০২১; এবছর এই বক্তৃতা প্রদান করেছেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার। মাতৃভাষা ব্যবহারের সামাজিক প্রচলটিকে বৌদ্ধিক পরিচর্যায় ও যুক্তিকাঠামোর বিন্যাসে কার্যকরীভাবে তুলে ধরার প্রয়াস তিনি বহুদিন ধরে গ্রহণ করেছেন। এই বক্তৃতায় সেসব কথাবার্তার কিছু ইশারা-ইঙ্গিত মিলবে। আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা মানচিত্রে যখন মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব ক্রমশ প্রাসঙ্গিক হচ্ছে তখন মাতৃভাষার ব্যবহার ও পরিচর্যার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার নতুন নতুন পরিসর তৈরি হচ্ছে। মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সেই প্রয়াসের প্রায়োগিক দিকগুলি নিয়ে নিরন্তর অনুশীলন করে চলেছে। অতিমারী পর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যক্রমের মত স্মারক বক্তৃতার আয়োজনও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সম্পন্ন করতে হয়েছে। বক্তৃতাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউ-টিউব চ্যানেলে ইতিমধ্যেই সংরক্ষিত হয়েছে। মুদ্রিত পাঠটি আগ্রহীদের চিন্তার খোরাক যোগাবে বলেই আমার বিশ্বাস।

এই বক্তৃতার আয়োজক হিসেবে এবং যথাযথভাবে বক্তৃতাটি মুদ্রণের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য মানববিদ্যা অনুষদের অধিকর্তা ও সকল সদস্যদের আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। ধন্যবাদ জানাই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক শ্রীযুক্ত কিশোর সেনগুপ্ত ও অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দকে।

অধ্যাপক শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাককথন

উপস্থিত শোতৃমণ্ডলী ও সুধীবর্গ,

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক বক্তৃতা আয়োজন করছি প্রায় এক দশকেরও বেশি সময় ধরে। একই সঙ্গে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতার আয়োজন বার্ষিক পর্যায়ক্রমে এই বিশ্ববিদ্যালয় করে থাকে। জনপরিসরে উপস্থাপিত এইসব বক্তৃতা ইতিপূর্বেই শ্রোতা দর্শকদের মধ্যে আগ্রহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। এমন পিপলস ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে হয়ে চলা নিরন্তর আলোচনার খোলামেলা পরিসরে মুক্তচিন্তার আবহকে এই বিশ্ববিদ্যালয় সম্মান জানায়।

ইতিপূর্বে এই আয়োজনে সাড়া দিয়ে বক্তব্য রেখেছেন উইলিয়াম রাদিচে, কেতকি কুশারী ডাইসন, হাসান আজিজুল হক, গণেশ দেবী, জহর সরকারের মত কৃতবিদ্য সৃজনশীল মানুষেরা।

আজ আমরা সকলে এই ভার্চুয়াল অনলাইন সভায় সমবেত হয়েছি, এমন এক সময়ে এই আয়োজন যখন সারা পৃথিবীতে থমকে আছে জনজীবন; একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনার সমষ্টিগত প্রয়াস প্রহত হয়ে আছে এক ভাইরাসের কাছে। মানবসভ্যতার অন্যতম বিপর্যয় হিসেবে চিহ্নিত এই অতিমারীর কালপর্বে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম আমাদের সামনে আলাপের নতুন সুযোগ ও সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। থমকে যাওয়া জীবন আবার শুরু করেছে আলাপ, গড়ে তুলতে শুরু করেছে কথা আদান-প্রদানের নতুন পরিসর।

আজকের সভায় সভাপতিত্ব করছেন সম্মাননীয় উপাচার্য মহাশয় অধ্যাপক শুভ শঙ্কর সরকার, উপস্থিত আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিবন্ধক শ্রীযুক্ত কিশোর সেনগুপ্ত মহাশয়। আজকের সম্মাননীয় অতিথি অধ্যাপক পবিত্র সরকার। তিনি বলবেন মাতৃভাষা ও শিক্ষা নিয়ে, আলাপ করবেন রবীন্দ্রনাথের অভিজ্ঞান স্পর্শ করে।

মাতৃভাষায় শিক্ষা একটি বহু চর্চিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঔপনিবেশিক শাসনের পথ ধরে এই আলোচনা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপরিসরে গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখব বিভিন্ন কালে শিক্ষণ-প্রকরণ বিষয়ে যাঁরা ভেবেছেন তাঁদের ভাবনাও ভাষাচিন্তার সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। আধুনিকতার যে প্রকল্প আমাদের ইউরোপমুখী করেছিল সেখানেও একটা বড় আলোচনার ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল শিক্ষার ভাষা সম্বন্ধে। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা বিশ শতকের গোড়ার দিকে আমাদের আলোকিত করেছিল যথেষ্ট। জনপরিসরে মাতৃভাষার ব্যবহার, তার প্রায়োগিক দিকসমূহ এবং সমাজ পরিসরে মাতৃভাষার স্থানাঙ্কের ওপর দাঁড়িয়ে নির্ধারিত হয়েছে জাতীয়তাবোধ এমনকি বিশ্বের সঙ্গে আত্মিক যোগের সম্পর্ক। 'শিক্ষার হেরফের', 'প্রসঙ্গ কথা', 'শিক্ষার বাহন' ইত্যাদি প্রবন্ধে, 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত বিবিধ লেখালিখির মধ্যে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ জনপরিসরের চলিষ্ণু এই সমস্যা নিয়ে নিরন্তর ভেবেছেন। কার্যকরী পথ অনুসন্ধানের খোঁজ চালিয়েছেন। 'প্রবাসী' তে প্রকাশিত 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' প্রবন্ধেও সেসব কথা চলেছে। আর শেষ জীবনে 'শিক্ষার সাঙ্গীকরণ', 'শিক্ষার বিকিরণ', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ' ইত্যাদি প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় সেই ভাবনা আরও গভীর প্রত্যয়ে প্রকাশিত হয়েছে। নিজ হাতে বিশ্বভারতীর মধ্য দিয়ে নীরিক্ষণ করেছেন ভারতবর্ষের সেই ঐতিহাসিক শিক্ষণ পদ্ধতির স্বরূপ। তবুও শেষ পর্যন্ত তা বৃহত্তর জনমানসের চিন্তায় কাঙ্ক্ষিত প্রভাব বিস্তার করে উঠতে কি পেরেছে? স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে (১৯১৯) রবীন্দ্রনাথের এই শিক্ষাভাবনা নথিবদ্ধ হয়েছিল; সেসব বক্তব্যকে বলা যায় ঔপনিবেশিক শাসকের চোখে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা।

আজ কলোনি প্রমুক্ত আমরা এসব থেকে অনেক দূরে দাঁড়িয়ে। একটা গোটা বাংলা ভাষার রাষ্ট্র আজ আমাদের পাশে উচ্চকিত। এপার-ওপার মিলে প্রায় চব্বিশ কোটি মানুষের বুনিয়াদী শিক্ষার বাহন এই মাতৃভাষা বাংলা। বিশ্বায়িত সংস্কৃতির পটে বাংলা ভাষাকেন্দ্রিক সংস্কৃতি এখন একটা অল্টারনেটিভ। ইংরেজির সঙ্গে সমঝোতার সমীকরণ, এমনকি গ্রহণ-পরিগ্রহণের সমীকরণের চরিত্রও বদলে গেছে। আজকের দিনে ভারতবর্ষের মত বহুভাষিক রাষ্ট্রকাঠামোয় দাঁড়িয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষার তাৎপর্য অনেকটাই আলাদা। এসব নিয়ে গভীর থেকে গভীরতর অনুধ্যানে যিনি জীবনের একটা বড় সময় ব্যয় করেছেন তাঁকেই আমরা আহ্বান জানিয়েছি আজকের বক্তৃতায়।

আজকের সভার বক্তা অধ্যাপক পবিত্র সরকার, দুই বাংলার বাংলাভাষী মানুষের বৌদ্ধিক চর্চায় যিনি জড়িয়ে থেকেছেন নানা ভাবে। কয়েক বছর আগে ঢাকা থেকে প্রকাশিত বাংলা প্রমিত ব্যকরণের কাজ সমাপ্ত করে উঠলেন অন্যতম সম্পাদক হিসেবে।

এই বাংলায় আজও ভাষার গবেষণা, জনপরিসরে প্রতিটি ভাষা বিষয়ক বিতর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া নিরন্তর ঋদ্ধ করে আমাদের।

আজ আমরা বাঙালি জীবনের পথিকৃৎ এক কবির নামাঙ্কিত এই স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করেছি এক মহান দেশনায়কের নামাঙ্কিত মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায়। জ্ঞান যেখানে উন্মুক্ত মন ও চেতনার কথা বলে সেই অভিমুখে এই বিশ্ববিদ্যালয় পথ হেঁটে চলেছে প্রায় সিকি শতক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মশতবার্ষিকীর সেই সূচনালগ্ন থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিদ্যায়তনিক কাজে সংযুক্ত থেকেছেন অধ্যাপক সরকার। আজ সারা দেশের মধ্যে সর্বপ্রথম কোনো রাজ্য সরকারী মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক 'এ' গ্রেডের মান্যতা লাভ করেছে এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি সম্মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে আহ্বান করছি অধ্যাপক পবিত্র সরকার মহাশয়কে তাঁর ষষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্মারক বক্তৃতা প্রদান করার জন্য।

অধ্যাপক মননকুমার মণ্ডল

অধিকর্তা, মানববিদ্যা অনুষদ
নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

২৯ জুন, ২০২১
অনলাইন জুম প্ল্যাটফর্ম, কলকাতা

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা : কতদিন, কতদূর

ভূমিকা

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ষষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ স্মারক বক্তৃতা দেওয়ার আমন্ত্রণ পেয়ে আমি সম্মানিত ও আনন্দিত বোধ করছি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কদাচিৎ শিক্ষক এবং দীর্ঘদিনের নানা বিষয়ে পরামর্শদাতা হিসেবে আমার যোগাযোগ, যে যোগাযোগের ফলে আমি মানবিক ও বিদ্যায়তনিক দুভাবেই সমৃদ্ধ হয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য্য, নিবন্ধক, অন্যান্য প্রশাসনিক ও বিদ্যায়তনিক কর্তা, অধ্যাপক এবং এই বক্তৃতার শ্রোতা-দর্শকদের যথোচিত সম্ভাষণ জানিয়ে আমি কয়েকটি কথা বলছি।

এই বক্তৃতার দুটি ভাগ। প্রথমটি একটি-দুটি পরিভাষাকে সুনির্দিষ্ট করার লক্ষ্য নিয়ে, এর ১ থেকে ৪ অংশ পর্যন্ত বিস্তারিত। পরিভাষা দুটি হল 'ভাষা' এবং 'মাতৃভাষা'। আর দ্বিতীয় অংশটি 'মাতৃভাষা'র মাধ্যমে শিক্ষাকে কতদূর বিস্তারিত করা যায় সে বিষয়ে জল্পনা। আপাতত অলস জল্পনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু উপনিবেশের শিক্ষাপ্রণালী ও তার অভ্যাস থেকে একটি পৃথক পথ সন্ধানের প্রয়াস হিসেবে একে দেখা যেতে পারে।

ভাষা কী, মাতৃভাষা কী

বিষয়টি প্রায় দুশো বছর ধরে বহুচর্চিত, কাজেই এ প্রশ্ন উঠতেই পারে যে, এ নিয়ে নতুন আর কী বলা সম্ভব। দ্বিতীয়ত, এই পরিভাষা-পরিমার্জনা কি এতই গুরুত্বপূর্ণ ? আমরা মনে করি গুরুত্বপূর্ণ। আবার তত্ত্বের দিক থেকে এও আমরা জানি যে, এ প্রশ্ন তখনই ওঠে, যখন আমরা ধরে নিই— যে ব্যবস্থা এখন চলছে তা সব ঠিকঠাকই আছে, অনেকদিনের ভাবনাচিন্তার ফলে একটা ব্যবস্থায় পৌঁছানো গেছে, তাতে আর নাড়াচাড়া দেওয়ার দরকার নেই। আমাদের উপনিবেশযাপনের সময় আমাদের

শিরোনামের প্রশ্নটা জরুরি ছিল, কারণ ঔপনিবেশিকদের ভাষা আমাদের ভাষাকে সরিয়ে 'রাজভাষা' হয়ে বসেছিল, আর রাজভাষা হলেই তাকে অনিবার্যতই শিক্ষাতে একটা আধিপত্যপূর্ণ স্থান দিতে হবে, নইলে রাজকর্ম পাওয়া দুষ্কর হবে। তাই ১৮৩৫ সালের ২ ফেব্রুয়ারি টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ইংরেজি-শাসিত শিক্ষানীতি প্রচারিত হল এবং দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের শিক্ষার ইতিহাস যাঁরা চর্চা করেন তাঁরা জানেন, নানা পরিবর্তনের পর তার সার কাঠামো এই দাঁড়াল যে, 'মাতৃভাষা'কে বাহন করে তার সরকারি আয়োজনে তার স্কুল ও কলেজ স্তরের কিছু বিষয় পড়ানো হয়, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ে মানবিক বিদ্যার বিষয়গুলিতেও 'মাতৃভাষা'য় পরীক্ষা দেওয়া যায়। পরীক্ষা দেওয়া যায় আর ক্লাসে 'মাতৃভাষা' ব্যবহার করে পড়ানো হয় এই দুই ঘটনা এক সঙ্গে চলে এমন নাও হতে পারে।[১] কিন্তু, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ডাক্তারি, ব্যবসায়-পরিচালনা, আইন ইত্যাদি বিষয়ে আমাদের উচ্চতর স্তরের পড়াশোনা মূলত ইংরেজির মাধ্যমেই করতে হয়। প্রাথমিক স্তরে শি-মাতৃভাষার (পরে দেখুন) কিছু ভূমিকা ছিল বটে, বিশেষত ১৮৫৪ সালে উইলিয়াম অ্যাডামের সুপারিশে তার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দেশের শিক্ষানীতিতে তার প্রভাব ছিল নগণ্য। কচরু (১৯৯৪ : ৮০৭) জানাচ্ছেন, "By 1882– over 60 percent of primary schools were imparting education through English."

পরে অবশ্য এই অবস্থাটা একটু বদলেছে। উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসন অপসৃত হওয়ার পরে অনেক দেশই নিজেদের ভাষাতে শিক্ষার প্রাথমিক ব্যবস্থা করেছে, এবং অনেক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও মাধ্যম নিজেদের ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে মানবিক বিদ্যার বিষয়গুলিতে। কিন্তু উচ্চশিক্ষায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ব্যবসায় পরিচালনা, আইন, চিকিৎসাবিদ্যা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে ইংরেজির ব্যবহার এখনও অব্যাহত। প্রায় পঁচাত্তর বৎসর ধরে এই স্থিতাবস্থা চলছে। এর মধ্যে শুধু নিজেদের ভাষার দাবি থেকে পৃথিবীতে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছে, আর তা ছাড়াও উপমহাদেশের নানা স্থানে একটি ভাষার ব্যাপক আধিপত্য (এমনকি পাকিস্তানেও উর্দু ভাষার স্থলে পাঞ্জাবি, পশ্‌তু বা সিন্ধি ভাষার) বা আপেক্ষিক মর্যাদা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অনেক ছোট ছোট (অনেক সময় প্রতিবেশে ছোট, আদতে ছোট নয়) ভাষাকে প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গে সাঁওতালি ও নেপালি, ত্রিপুরায় কগবরক ইত্যাদি। কিন্তু প্রশাসনের বাইরে এসে শিক্ষার ক্ষেত্রে ভাষানীতির বিষয়ে যে প্রশ্ন তোলা উচিত ছিল তা হয়নি, এমনকি ভারতের নতুন শিক্ষানীতিতেও হয়নি।

নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আমরা এই স্থিতাবস্থা নিয়ে আবার প্রশ্নটা তুলছি কারণ আমাদের মনে হয়েছে এখন এই প্রশ্ন তোলার সময় এসেছে। আর এই প্রশ্ন শুধু একটা ব্যবস্থার বাতিল করার কথা ভেবে নয়, তাকে আরও সার্থক ও যুগোপযোগী করার কথা ভেবেও। আমাদের দাবিটা বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তাই অবাস্তব, তাই অকার্য্যকর ইত্যাদি কথা শোনবার জন্য আমরা প্রস্তুত আছি, কিন্তু কথার সঙ্গে যুক্তিও আমরা আশা করব। আমরা জানি যে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার একটা বিপুল ব্যবস্থা আমাদের উপমহাদেশে গড়ে উঠেছে, তাও আমাদের প্রশ্নকে সহানুভূতি নিয়ে না দেখার জন্য উদ্যত হবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের পাঠকদের কাছে[২] আমাদের এই কথাগুলি হাজির করতে চাই এই কারণে যে আমাদের মতে বাংলাদেশে বাংলাভাষার যে বিশেষ স্থান ও গৌরব, তাতে এ কথাগুলি কিছুটা বিবেচনাযোগ্য মনে হতে পাবে[৩]।

'মাতৃভাষা' (Mother Tongue) বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক বিভ্রান্তি ও তার অপনোদন

সকলেই জানেন, ঊনবিংশ শতাব্দীতেই 'মাতৃভাষা' কথাটি বিনা প্রশ্নে শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে শুরু করে। বাঙ্গালা ভাষা কথাটিও। এর আগে 'ভাষা' কথাটি মধ্যযুগে ব্যবহৃত হয়েছে, 'দেশি ভাষা'ও যেমন আবদুল হাকিমের (১৬২০-১৬৯৩) সেই বিখ্যাত ছত্রে দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়'। কিন্তু 'বাঙ্গালা ভাষা' কথাটা, আমাদের মতে, মধ্যযুগের মুসলমান কবিরাই প্রথম ব্যবহার করেন, 'বাংলা' নামটাও যেমন মুসলমান শাসকদের দান, পরে পোর্তুগিজেরা একে গ্রহণ করে Bengalla হিসেবে এবং তা থেকে ইংরেজি Bengal– Bengali ইত্যাদি কথাগুলি তৈরি হয়। যেমন যোড়শ শতকে হাজী মহাম্মদ লেখেন 'বাঙ্গালা অক্ষর পরে আঞ্জী মহাধন', বা সপ্তদশ শতকে আবদুন-নবী লেখেন 'মুসলমানী কথা দেখে মনেতে ডরাই ; রচিলে বাঙ্গালা ভাষে কোপে কি গোঁসাই' (সূত্রের জন্য সরকার, ২০০৩ : ২৪-৭৪) দেখুন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন রায় অবশ্য 'গৌড়ীয় ভাষা' কথাটি ব্যবহার করেন। তা ছাড়া 'মাতৃভাষা' কথাটি ব্যাপকভাবে গৃহীত হয়, ওই শতাব্দীতে যার স্মরণীয়তম উচ্চারণ মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'পাইলাম কালে, মাতৃভাষা-রূপ খনি পূর্ণ মণিজালে।' এখানে মাতৃভাষাকে নান্দনিক আত্মপ্রকাশের এক শ্রেষ্ঠ মাধ্যমের উপায় বলে স্বীকৃতি জানানো হয়েছে। কিন্তু হয়তো তার আড়ালে প্রচ্ছন্ন আছে মাতৃভাষা শিক্ষার বিষয়টি, উপযুক্তভাবে শিক্ষা না হলে প্রকাশের শক্তি আসবে কোথা থেকে ? এ ছাড়া সাংবাদিক-পদ্যকার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত 'মাতৃভাষা' নামে কবিতাও প্রকাশ করেন। এবং মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের প্রসঙ্গটি তাতে স্পষ্টভাবেই এসেছে (বর্মণ ১৯৯৯ দ্র.)।

এখানে আমাদের লক্ষ্য নয় ‘বাংলা ভাষা’ কথাটির গ্রহণ বা প্রয়োগ-বিস্তারের বিবরণ নির্মাণ। আমাদের মূল মনোযোগ ‘মাতৃভাষা’ কথাটির অর্থ ও ব্যঞ্জনার প্রতি, বিশেষত শিক্ষাদানে এই ‘মাতৃভাষা’র ভূমিকা সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিদের সচেতনতা। আমরা দেখব যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ‘মাতৃভাষা’ কথাটির প্রচলন ব্যাপক হয়েছে। শিক্ষা ও মাতৃভাষা এই সংযোগটি আমাদের মতে বাঙালির মনে শক্তিশালী হয়েছে ১৮৩৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানি প্রবর্তিত টমাস ব্যাবিংটন মেকলের ইংরেজি পোষিত শিক্ষানীতির পর থেকে। কারণ ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় একটি বিরোধের (আধিপত্য, শত্রুতা, ভীতিপ্রদর্শন, অবহেলার বোধ, প্রতিযোগিতা, ব্যঙ্গবিদ্রুপ নানা রূপ হতে পারে এই বিরোধের) দ্বারা আক্রান্ত না হলে কোনও ধারণাই মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে না (Fishman, ১৯৯৭)।

এই মাতৃভাষা একটি সরলীকৃত ধারণা : যথার্থ মাতৃভাষা কী তা এতে প্রতিফলিত নয়

তবে এই মাতৃভাষা একটি সরলীকৃত ধারণা এবং এই অস্পষ্ট ধারণা থেকেই আমরা বাঙালিরা বলি, ‘বাংলা আমাদের মাতৃভাষা’। আসলে আমাদের ‘ভাষা’র ধারণাটিই সরলীকৃত, সাধারণ মানুষের এবং ভাষার ব্যাপারে অবিশেষজ্ঞ পণ্ডিত আর মনীষীদেরও। আসলে বাংলা বা যে-কোনও বড় ভাষা একটি নাম বহন করলেও একটি অখণ্ড, অবিমিশ্র, সংহত ভাষা নয়। বরং তা অন্য বড় ভাষার মতোই অনেকগুলি গোষ্ঠীবচনের একটি সমবায়ী গুচ্ছ। এই গোষ্ঠীবচনগুলি একদিক থেকে অঞ্চল অনুযায়ী ভিন্ন হয়ে যায়, তখন তাদের আঞ্চলিক উপভাষা (regional dialect) বলা হয়, আবার একই সঙ্গে বক্তার শ্রেণি (বিত্ত, শিক্ষা, জীবিকাচরিত্র ইত্যাদি) অনুযায়ী অল্পবিস্তর ভিন্ন হয়, তখন তাকে বলা হয় শ্রেণিভাষা (sociolect)। আমাদের মতে (সরকার, ২০০৩ : ১১-১২) ওই উপভাষা আর শ্রেণিভাষার সংযোগ ও মিশ্রণেই ব্যক্তিবিশেষের আসল মাতৃভাষা তৈরি হয়। কারণ মানুষ ব্যক্তিগত এবং পারিবারিকভাবে একই সঙ্গে একটি অঞ্চলের, এবং সেই সঙ্গে একটি শ্রেণির। মাতৃভাষা আসলে ব্যক্তির জন্মগত/পালনগত পরিবারের ভাষা, যা সে শৈশবে প্রথম শেখে, ভাষাবিজ্ঞানে যাকে বলে language 1। এর শিক্ষার ধরনও আলাদা, তা আমরা পরে দেখব। এই মাতৃভাষায় শিক্ষার কথা কোনও মনীষীই বলেন না। অথচ ‘মাতৃভাষায় শিক্ষা’ কথাটা আমরা প্রায় দুশো বছর ধরে শুনে আসছি।

তবে লৌকিক মতে, এবং রবীন্দ্রনাথ, গান্ধিজি এবং পৃথিবীর অসংখ্য মনীষের

কাছে, প্রচলিত বয়ানের মাতৃভাষা আসলে কী ? তা আসলে ওই গোষ্ঠীগুলির 'শিক্ষিত ভাষা' অর্থাৎ প্রমিত ভাষা, ইংরেজিতে যাকে বলে standard। বাংলায় এই তথাকথিত 'মাতৃভাষা' হল প্রমিত বাংলা, (Standard Colloquial Bangla SCB)। এটা সবাই জানেন যে, ভাষাবিজ্ঞানের অর্থে প্রমিত বাংলা বহু বাঙালিরই 'মাতৃভাষা' নয়, এটি তাদের বেশিরভাগকেই স্কুলে এসে শিখতে হয়। এখন স্কুলে আশার আগেও হয়তো ঘরে রেডিয়ো বা টেলিভিশন থাকলে তাতে এই প্রমিত ভাষা শোনবার সুযোগ হয়, আর এই সব শ্রুতিমাধ্যম ছাড়াও মা-বাবার সঙ্গে শহর-বাজারে গেলে হয়তো মুখের প্রমিত ভাষা শোনবার সুযোগ পায়। কানে শুনেও শিশু ভাষার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে, কারণ বয়ঃসন্ধির আগে পর্যন্ত কানে শুনে আর মুখে বলে শিশুর ভাষা শেখার একটা বিশেষ প্রবণতা থাকে, নোয়াম চম্‌স্কি যাকে বলেন LAD Langugage Acquisition Device.এই acquisition কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে, পরেও এর প্রসঙ্গ আসবে।[৪]

এই প্রমিত ভাষারূপটির বৈশিষ্ট্য কী। আগেই আমরা বলেছি যে, একটি ভাষা অনেকগুলি ভাষারূপের একটি গুচ্ছ, এবং এই প্রমিত রূপটি ওই গুচ্ছের একটি অন্যতম রূপ। শুধু অন্যতম নয়, এটি সবচেয়ে শক্তিশালী, মর্য্যাদাসম্পন্ন এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ভাষারূপ। আমরা নীচে এ দুয়ের ব্যবহার ও মর্য্যাদার পার্থক্যের কারণগুলি দেখাই

আসল মাতৃভাষা = ঘরের ভাষা সরলীকৃত অর্থে মাতৃভাষা = প্রমিত ভাষা

১ পরিবারে ও অঞ্চলে ব্যবহৃত	১ সমগ্র ভাষা-অঞ্চলে ব্যবহৃত
২ প্রধানত মৌখিক	২ মৌখিক ও লিখিত/মুদ্রিত
৩ প্রশাসনিক ভাষা নয়	৩ প্রশাসনিক ভাষা
৪ লেখাপড়ার ভাষা নয়	৪ লেখাপড়ার ভাষা
৫ পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যের ভাষারূপ নয়	৫ পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যের ভাষারূপ

এই ভাগগুলি যে জল-অচল নয় তা সকলেই জানেন, একটার সঙ্গে আর-একটা জড়িত এবং কার্যকারণ সম্বন্ধে আবদ্ধ। আশা করি এই বিষয়গুলির বিস্তারিত ব্যাখ্যার দরকার নেই। তবু দু-একটি মন্তব্য যোগ করা যায়। প্রমিত ভাষারূপ সমগ্র অঞ্চলে মৌখিকভাবে ব্যবহৃত, তার প্রথম কারণ এর ভাষাপ্রাচীর লঙ্ঘনের ক্ষমতা : পুরুলিয়ার বাঙালি চট্টগ্রাম বা সিলেটের বাঙালির সঙ্গে তাঁদের আঞ্চলিক ভাষায় কথা বললে পারস্পরিক বোধগম্যতা ব্যাহত হয় তাই দু পক্ষ বাধ্য হন মুখে যথাসম্ভব প্রমিত রূপটি

ব্যবহার করতে। দ্বিতীয় কারণ, আঞ্চলিক ভাষা আঞ্চলিক সংবাদ মাধ্যমে (রেডিয়ো-টেলিভিশনে), নাটক-গল্প উপন্যাসের সংলাপে কখনও ব্যবহৃত হলেও তা সাহিত্যের বিবৃতির ভাষা নয়। গল্প উপন্যাসের বর্ণনা, প্রবন্ধের ভাষা, পাঠ্যপুস্তকের আলোচনার ভাষা তা নয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তি, আইন, নির্দেশ ইত্যাদির ভাষাও মূলত প্রমিত ভাষা। আর তৃতীয়ত, প্রমিত ভাষারূপটি বিদ্যায়তনিক আলোচনার ভাষা, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্লাসঘরে শিক্ষাদানের ভাষা, অন্তত প্রাথমিক স্তরের উপরে তো বটেই। এর ভূমিকা এত ব্যাপক বলেই এর শক্তি এবং মর্য্যাদাও বেশি। সরকার, ১৯৮৪/২০০৫-এর দুটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে দেখুন। তারই কিছু যুক্তি এখানে পুনরুপ স্থাপিত হয়েছে।

ফলে সাধারণ বোধে ভাষা = প্রমিত ভাষা = মাতৃভাষা এই সরল সমীকরণ তৈরি হয়ে গেছে, মনীষী আর পণ্ডিতেরাও সেই সরলীকরণের অধীনতা এড়াতে পারেননি। মাতৃভাষা না হলেও বিদেশি শিক্ষার্থী যখন বলেন, 'আমি বাংলা শিখছি', তখন তিনি বাংলা প্রমিত ভাষার কথাই বলেন, এমন কি নোয়াখালির বা বাঁকুড়ার বাঙালি যখন বলেন, 'আমার মাতৃভাষা বাংলা' তখনও তিনি প্রমিত বাংলার কথাই মূলত মনে রাখেন।[৫] এমনকি ভাষার সম্মান রক্ষার জন্য যে শহিদেরা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন, তাঁরাও তাঁদের ঘরের বা আঞ্চলিক ভাষার কথা ভেবে জীবন বিসর্জন করেননি। এই সর্বগৃহীত প্রমিত বাংলাই ছিল তাঁদের কাছে মাতৃভাষা। এটা বাঙালির আচারিক formal ভাষা, তাই বাংলাভাষা = বাংলা প্রমিত ভাষা এই সমীকরণ এত সহজ হয়েছে। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর অনেকটা জুড়ে বাঙালির লিখিত প্রমিত ভাষার আর-একটি ছিল, যার নাম 'সাধু ভাষা', কিন্তু ১৯৬৬ সালের ২২ মার্চ থেকে পশ্চিমবাংলার *আনন্দবাজার পত্রিকা* চলিত বা প্রমিত বাংলায় সংবাদ পরিবেশন আরম্ভ করায় ধীরে ধীরে প্রমিত মৌখিক বাংলা বাঙালির আচারিক ভাষা হিসেবে এখন প্রায় একচ্ছত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চলেই। আমরা এই আসল মাতৃভাষা (ভাষা ১) থেকে এই শিক্ষায় ব্যবহৃত 'মাতৃভাষা'কে 'শি-মাতৃভাষা' বা ইংরেজিতে -MT (Mother Tongue used in instruction) হিসেবে নামাঙ্কিত করার সুপারিশ করেছি (Sarkar, ২০২১).

শিক্ষায় এই 'মাতৃভাষা'র ব্যবহার, মনীষীদের কিছু উল্লেখ

এই অর্থে মাতৃভাষায় শিক্ষা যে মনীষীদের কাম্য ছিল, তার বহু দৃষ্টান্ত আছে, তারও ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত এখানে নিষ্প্রয়োজন। আমরা শুধু দুজনের কথা এখানে

বিশেষভাবে উল্লেখ করব। রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধি। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০৮ সালে, তার প্রথম প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের'-এই (১৮৯২) তিনি আমাদের আনন্দহীন, বোধহীন, স্বকীয় চিন্তাহীন ও কল্পনাদীন শিক্ষাজীবনের একটা কারণ নির্দেশ করেন। আমাদের 'বিজাতীয়' ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা "আমাদিগকে বহুকাল পর্যন্ত শুদ্ধমাত্র ভাষাশিক্ষায় ব্যাপৃত থাকিতে হয়। ...ইংরেজি এতই বিদেশীয় ভাষা এবং আমাদের শিক্ষকেরা এতই অল্পশিক্ষিত যে, ভাষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব আমাদের মনে সহজে প্রবেশ করিতে পারে না। এইজন্য ইংরেজি ভাবের সহিত কিয়ৎপরিমাণে পরিচয় লাভ করিতে আমাদিগকে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিতে হয় এবং ততক্ষণ আমাদের চিন্তাশক্তি নিজের উপযুক্ত কোনো কাজ না পাইয়া নিতান্ত নিশ্চেষ্টভাবে থাকে। এন্‌ট্রেন্‌স এবং ফার্স্ট-আর্টস পর্যন্ত কেবল চলনসই রকমের ইংরেজি শিখিতেই যায় ; তার পরেই সহসা বি. এ. ক্লাসে বড়ো বড়ো পুঁথি এবং গুরুতর চিন্তাসাধ্য প্রসঙ্গ আমাদের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া হয় ; তখন সেগুলা ভালো করিয়া আয়ত্ত করিবার সময়ও নাই, শক্তিও নাই..." (ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, দাশগুপ্ত (স.) ১৯৯২ : ৩১৪)। এখানে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি মাধ্যমের নেতিবাচক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া কিছু উল্লেখ করেছেন। এ সম্বন্ধে সরকার (১৯৯৮) কিছু আলোচনা করেছে। ইংরেজিতে যাকে lost in transit বলা হয়, বিদেশি ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান ও চিন্তা সঞ্চারে সেই বিপদের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। 'মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ' এই উপমাটি রবীন্দ্রনাথ এই ধরনের পরিপ্রেক্ষিতেই ব্যবহার করেন, পরে 'শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ' প্রবন্ধেও (১৯৩৬) আমরা তার পুনরুল্লেখ দেখব। আমরা দেখি মহাত্মা গান্ধিও ১৯৪৬ সালের ২৫ আগস্টের হরিজন পত্রিকায় এই কথাটিই ব্যবহার করে লেখেন, 'I must cling to my mother tongue as to my mother's breast– in spite of its short-comings. It alone can give me the life-giving milk. (গুগ্‌ল সূত্রে)।

এই সরলীকরণ বহুধা বিস্তারিত, তা আমরা লক্ষ করি।

নতুন ভারতীয় শিক্ষানীতিতে বিভ্রান্তি

কিন্তু একটি বৃহৎ দেশে যাঁরা শিক্ষানীতি রচনা করবেন তাঁরাও একই সরলীকরণের বশীভূত হবেন এমন আমাদের প্রত্যাশা থাকে না। আমাদের এই হতাশার কারণ ভারত সরকারের মানব-সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর প্রকাশিত দুটি শিক্ষানীতি বিষয়ক দলিল, ২০১৯-এর একটি খসড়া এবং ২০২০-র চূড়ান্ত নীতিপুস্তক। দুটিতেই মাধ্যম হিসেবে ভাষার ভূমিকাতে যেমন কিছুটা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তেমনই স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত ক-টি ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে তারও নির্দেশ আছে। অন্যান্য ভাষাশিক্ষার

বিষয়টি আমাদের বর্তমান নিবন্ধের দ্বিতীয়াংশে আমরা আলোচনা করব। কিন্তু ওই 'মাতৃভাষা' বিষয়টি এঁদের হাতে কী উল্লেখ পেয়েছে তা দেখা যাক।

এই শিক্ষানীতির প্রথম ভাগে আমরা দেখব যে, Home Language Mother Tongue ঠেস চিহ্ন দিয়ে এই দুটি বিকল্প এঁরা একাধিকবার ব্যবহার করেছেন। (খসড়া ৮০ পৃ., চূড়ান্ত ১৩ পৃ)। আমাদের উপরের আলোচনা থেকে আশা করি বোঝা যাবে যে, এই বিকল্পন বৈধ নয়, কারণ ভাষাবিজ্ঞানের মতে এ দুটি একই ভাষারূপ। এঁরা কীভাবে এ দুটিকে তফাত করছেন তার কোনও বিশেষ ব্যাখ্যা এঁরা দেননি। যেন ধরেই নিয়েছেন যে, সকলের কাছেই এই তফাত জলের মতো পরিষ্কার। খসড়ার এই অংশের (৪.৫) শিরোনামে (p. ৭৯) আবার Local Language Mother Tongue বিকল্প খাড়া করা হয়েছে। এর তবু একটা মানে আছে। আগে যেমন বলেছি, অভিবাসীদের ছেলেমেয়েদের অভিবাসনস্থলের ভাষাতে লেখাপড়া শিখতে হয়, ভারতের মতো বহুভাষী দেশে এটা প্রায়ই ঘটে, বিদেশে গেলে তো ঘটেই (৬ সংখ্যক টীকা দ্র.)। ফলে স্থানীয় ভাষা বলতে তাঁরা বুঝিয়েছেন সেই জায়গার শি-মাতৃভাষা। আর মাতৃভাষা তাঁদের কাছে শিক্ষার্থীদের নিজেদের শি-মাতৃভাষা। কিন্তু চূড়ান্ত নীতিতে আবার মোট চারটি সম্ভাবনা তাঁরা নির্দেশ করেছেন (পৃ. ১৩)—Home Language Mother Tongue Local Language Regional Language. আগেই বলেছি, প্রথম দুটি বিকল্পের কোনও বিজ্ঞানসংগত অর্থ নেই দুটিই আমাদের কাছে এক। এবং এ দুটির কোনওটিই শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে না, স্কুল স্তরে বিষয়ও না।

স্থানীয় ভাষা আর আঞ্চলিক ভাষার প্রসঙ্গ আসে ভাষাগত সংখ্যালঘুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে। সংখ্যালঘুরা স্থায়ী বাসিন্দা বা অভিবাসী দুইই হতে পারে। ভূমিপুত্ররা হয়তো অন্য কোনও ক্ষুদ্র ভাষার মানুষ, আর অভিবাসীরা অন্যত্র একটি বড় ভাষা ব্যবহার করেন, কিন্তু এই অঞ্চলে সংখ্যালঘু। দুইই হতে পারেন কেউ কেউ। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, এবং নিবন্ধের দ্বিতীয় অংশে আমরা এ বিষয়টি নিয়ে আরও বলব। অনেক সময়েই ছোট গোষ্ঠীভাষার ছাত্রছাত্রীদের জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে সমস্যাসংকুল হয়ে ওঠে, তাই তাদের জন্য ব্যপকতর যোগাযোগের ভাষা বা Language of Wider Communication (LWC)-কেই শিক্ষায় ব্যবহার করতে হয়, মাধ্যম হিসেবে। এটা লক্ষ করে যে, ছোট গোষ্ঠীগুলি ওই ভাষাটি দৈনন্দিন কাজে কর্মে ওই ভাষাটিকে ব্যবহার করে।

সে ঠিকই আছে, কিন্তু এতগুলি বিকল্প পাশাপাশি দেওয়ার ফলে শিক্ষানীতি প্রণেতাদের অন্তত এই ব্যাপারে অনভিজ্ঞতা দেখে আমরা একটু হতাশা বোধ করি।

সেই কারণেই আমরা শি-মাতৃভাষা ইত্যাদি পরিভাষার প্রস্তাব করেছি। এর পরে এই প্রতিবেশে আমরা শি-মাতৃভাষা কথাটিই ব্যবহার করব।

আমাদের দ্বিতীয় প্রস্তাব : শি-মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা

২০২০-র ভারতীয় শিক্ষানীতির কতকগুলি কথা থেকেই আমরা আমাদের আলোচনার সূত্রপাত করব। চূড়ান্ত পুস্তিকায় তাঁরা বারোটি অনুচ্ছেদ জুড়ে (৪.১১-৪.২২, pp. ১৩-১৫) বহুভাষিকতার গুণগান করেছেন। এ সম্বন্ধে আমরা পরে আমাদের মতামত বলব। তবে প্রথম পরিচ্ছেদেই বলেছেন,

Whenever possible– the medium of instruction until at least Grade 5– but probably till Grade 8–and beyond– will be the home language mother tongue local language regional language.

তার পরেই বলা হয়েছে, "Thereafter– the home local language should be taught as a subject." (p. ১৩).

এই কথাগুলিকে আমরা একটু বিশ্লেষণ করি। আমরা দেখি যে নীতিপ্রণেতারা শি-মাতৃভাষার যে ভূমিকা নির্দেশ করেন তা চিরাচরিত ভাবনা থেকে খুব আলাদা নয়। স্বাধীনতার পর থেকে ভারত সরকারের যত কমিটি, কমিশন ইত্যাদি কেন্দ্রীয় স্তরে বা রাজ্যস্তরে হয়েছে তার বেশিরভাগই শি-মাতৃভাষা সম্বন্ধে এর বেশি আশাপূর্ণ ভূমিকার কথা ভাবতে পারেননি (Sarkar, ১৯৯৮)-এর একটি পর্যালোচনা আছে)। তাতে সকলেই শি-মাতৃভাষার মাধ্যমে স্কুলের প্রথম চারটি বা পাঁচটি ক্লাস পড়ানোর কথা বলেছেন। তখন বলা বা ইঙ্গিত করা হয়েছে, দ্বিতীয় ভাষা, দক্ষিণ এশীয় বাস্তবতায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি, পড়ানো হবে না। তার পর দ্বিতীয় ভাষা, আবার বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ইংরেজি, যোগ করা হবে। প্রথমে মাধ্যমমাত্রিক একভাষী শিক্ষা, তার পরে দ্বিতীয় ভাষা বিষয় হিসেবে শিক্ষা, কিন্তু উচ্চস্তরে একাধিক ক্ষেত্রে শি-মাতৃভাষা হয়তো বিষয়মাত্র হবে, আর দ্বিতীয় ভাষা, অর্থাৎ ইংরেজি অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাধ্যম হিসেবে স্থান দখল করবে।

ভারতের সাম্প্রতিক শিক্ষার ইতিহাস যাঁরা জানেন তাঁরা এও জানেন যে, প্রথম চার-পাঁচটি ক্লাসে একভাষার নীতি থেকে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার ক্রমে ক্রমে সরে আসতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশ্চাদপসরণের ইতিহাসটি এই রকম : ১৯৭৪ সালে গঠিত হিমাংশুবিমল মজুমদার কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করে তারা ১৯৮৪ সাল থেকে ক্লাস সিক্স থেকে ইংরেজি (বার্তালাপের ইংরেজি বা

communicative English) শেখানো শুরু করে। মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর দাবিতে ১৯৯১ সালে অশোক মিত্র শিক্ষা কমিশন তাকে পঞ্চম ক্লাসে নামিয়ে আনতে বাধ্য হয়। ১৯৯৮ সালে আবার পবিত্র সরকার কমিটি তাকে তৃতীয় শ্রেণি থেকে শুরু করার সুপারিশ করে, এবং ২০০১ সালে একটি বিশেষ অধ্যাদেশের সাহায্যে প্রথম শ্রেণি থেকেই ইংরেজি পড়ানো রীতিমতো শুরু হয়ে যায়। ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পাঠ্যক্রমে চলে আসে, এবং কোনও কোনও রাজ্যে সরকারি নির্দেশেই স্কুলের উপরের ক্লাসে মাধ্যম হিসেব গৃহীত হয়, পাঞ্জাবে যেমন।

এর কারণ একাধিক। তা এই উপমহাদেশের বিবর্তমান সমাজব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত। এই লেখক সমাজবিজ্ঞানী বা সমাজের ঐতিহাসিক নন, ফলে কয়েকটি সাধারণ বিষয়ই আমরা পাঠকের বিবেচনার জন্য উল্লেখ করছি। একটি হল মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিপুল প্রসার, কিন্তু এই বিষয়ে শুধু মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে দায়ী করা যায় না। যাঁরা মধ্যবিত্ত বা তথাকথিত 'বাবু' নন, যাঁদের সমাজতত্ত্বের ইংরেজি পরিভাষায় proto-lite বলা হয়, তাঁরাও তাঁদের 'বাবু' শ্রেণিতে গণ্য না-হওয়ার কারণ হিসেবে তাঁদের ইংরেজি ভাষা না-জানাকেই দোষ দিয়েছেন, এবং 'বাবু' না-হওয়ার জন্য তাঁদের অপ্রাপ্য বা নেতিবাচক প্রাপ্যগুলির (ভাষা ও ব্যবহারে 'বাবু'দের কাছ থেকে প্রাপ্য অবজ্ঞা বা অমর্যাদা, বাংলায় 'বাবু'দের থেকে 'তুই' বা 'তুমি' সম্বোধন অর্থাৎ 'আপনি' সম্বোধনের অভাব ইত্যাদি, পোশাকে-আশাকে আরোপিত ভিন্নতা, 'ছোটলোক' বা 'অশিক্ষিত' সম্বোধন/উল্লেখ, যদিও নিরক্ষররা মোটেই 'অশিক্ষিত' নন, কারণ শিক্ষা শুধু পুথিপত্রের মধ্য দিয়ে হয় না) হিসেব করেছেন, ফলে তাঁদের সন্তানদের জন্যও ইংরেজি শিক্ষার তাগিদ তাঁদের মধ্যে প্রবলভাবেই জেগেছে। এই নিবন্ধলেখক সহ অনেকেরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এটা দেখা গেছে যে গৃহপরিচারিকারাও তাঁদের সন্তানদের সুলভ ইংরেজি-মাধ্যম স্কুলে ভর্তি করেছেন, সরকারি বিনাশুল্কের স্কুলকে পরিহার করে। এই সামাজিক আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তনের প্রতিফলন ভোটের বাক্সে পড়তে পারে, রাষ্ট্রের এই ভয় ছিল, তাই কয়েক বছর বাদে বাদে ইংরেজি শিক্ষা বিষয়ে সিদ্ধান্ত বদল করতে হয়েছে।

এখনও পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্তরে এই প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি নীতি আছে। কিন্তু বহু মধ্যবিত্ত পিতামাতা সরকারি ব্যবস্থায় যেটুকু ইংরেজি শেখে তাতে সন্তুষ্ট নন, তাঁদের মনের মধ্যে ইংরেজি শিক্ষিতের একটি উচ্চ সাংস্কৃতিক আদল আছে, যাতে শুধু ভাষাটি ইংরেজ বা আমেরিকানদের মতো বলতে পারা নয়, তার সঙ্গে পাশ্চাত্যের বেশভূষা, চালচলন ও আদবকায়দার এবং শরীরী ভাষ্যের একটি সাংস্কৃতিক ('সাহেব-মেমদের মতো') ছবিও আছে। এমনকি আগেকার ধুতি-পাঞ্জাবি বা

পাজামা-পাঞ্জাবি পরা ডাকসাইটে ইংরেজিনবিশদের (নীরদ চৌধুরী, অশোক মিত্র এবং আমাদের সময় পর্যন্ত বহু ইংরেজির অধ্যাপক) ছবিও তাঁদের উদ্দীপ্ত করে না। তাঁরা তাঁদের সন্তানদের সাহেবশ্রেণির ওই ছবিটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে চান। মাদ্রাসা, টোল, শান্তিনিকেতন ও রামকৃষ্ণ মিশনের কিছু আশ্রমিক ধরনের স্কুল ছাড়া স্কুলের পোশাকে আমরা বিলিতি হাফ বা ফুল-প্যান্ট, মেয়েদের জন্য শার্ট ও স্কার্ট, সেই সঙ্গে শু ও মোজা ইত্যাদি আমরা বহু ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছি, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলিতে তার সঙ্গে টাইও যুক্ত হয়েছে। মেয়েদের জন্য শাড়ি-জামা বা শালোয়ার-কামিজ-ওড়না উঁচু ক্লাসে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তাই সাহেব-মেম হওয়ার বহিরঙ্গের প্রস্তুতির ক্ষেত্রে আমরা অনেকটা এগিয়ে গেছি, কাজেই ভাষাটা যোগ হলে আমাদের সন্তানেরা ওই কাঙ্ক্ষিত বিগ্রহের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, এমনই ভাবনা গায়ের রং বদলানো না গেলেও। সেহেতু অভিভাবকেরা শ্রেণিস্তর ভেঙেচুরে ইংরেজি মাধ্যমের দিকে ঝুঁকেছেন, এবং তারই ফলে ভারতে এক বিশাল ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল-ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশেও তার প্রসার ঘটেছে জানি।

অবশ্যই সব ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল এক রকমের নয়। এই মাধ্যমেরও বড়লোকের স্কুল আর গরিবের স্কুল আছে, বিশেষত ইদানীংকালে ওই উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমাজের মধ্যবিত্ত স্তরেরও তলার দিকে বিস্তারিত হওয়ায় গরিবের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের যথেষ্ট প্রসার ঘটেছে। আগে ভারতের পাহাড় অঞ্চলে (দেরাদুন, শিমলা, দার্জিলিং, শিলং ইত্যাদি) নানা পাব্লিক স্কুল ছিল, শহর অঞ্চলেও পাদরি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ইংরেজি মাধ্যম স্কুল ছিল। সে সব স্কুল থেকে জুনিয়র ও সিনিয়র কেম্ব্রিজ ইত্যাদি পরীক্ষা দেওয়া যেত। কলকাতায় যেমন সেন্ট জেভিয়ার্স, সেন্ট লরেন্স, লা মার্টিনিয়ার ইত্যাদি। এখন যেমন কিছু বড়লোকের বেসরকারি স্কুলে সিবিএসই বা অইএসসি ইত্যাদি কেন্দ্রীয় বোর্ডে ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনা চলে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ শি-মাতৃভাষার (বাংলা ছাড়া অন্যান্য শি-মাতৃভাষাও, যেমন সাঁওতালি, নেপালি, হিন্দি ইত্যাদি আছে)। কিন্তু পরবর্তী কালে ইংরেজি মাধ্যমের এই ব্যাপক অভীপ্সার ফলে প্রচুর 'গরিবের ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হওয়াই স্বাভাবিক। পশ্চিমবঙ্গ এবং অন্যান্য প্রাদেশিক সরকারও কিছু স্কুলকে অন্তত উপরের ক্লাসে ইংরেজি মাধ্যমে উন্নীত করেছেন, এবং নির্বাচিত প্রাথমিক স্কুলকেও ইংরেজি মাধ্যম করার কথা ভেবেছেন[৭]।

এ অংশের প্রথমে আমরা দেখেছি যে, নতুন ভারতীয় শিক্ষানীতির প্রণেতারা ঠিক এই ব্যবস্থা চান না। তাঁরা শি-মাতৃভাষার জন্য শিক্ষার প্রথম দিকে (till Grade 8–

and beyond) মাধ্যমের মর্যাদা বরাদ্দ করেছেন। ইংরেজি মাধ্যমের কথা তাঁরা কোথাও বলছেন না।

এই না-বলা নিয়ে আমাদের মনে যে প্রশ্ন সেটা এই : এটা কি শক্তপোক্ত সরকারি নীতি হবে ? সমস্ত স্কুলে এই নীতি চালু করা হবে ? তা হলে ভারতে এতদিন ধরে যে প্রবলপ্রতাপ ইংরেজিমাধ্যম শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তার কী দশা হবে ? এ ব্যাপারে তাঁরা যে নৈঃশব্দ্য রক্ষা করেছেন তাকে ইংরেজিতে coy silence বলা যায়। ব্যঞ্জনা এই যে, ওই ব্যবস্থা চলবে। অর্থাৎ ভারতে নানা সমান্তরাল শিক্ষাব্যবস্থা চলবে। যতদূর অনুমান, সমগ্র দক্ষিণ এশিয়াতেই এই চিত্র বহাল আছে। এ প্রায় এক নিয়তির মতো। এই নিয়তি কি অলঙ্ঘনীয় ? আমরা তা মনে করি না।

আমরা যদি এবার বলি যে, দক্ষিণ এশিয়ার যে কোনও দেশের শিক্ষা ও ভাষার এই দীর্ঘস্থায়ী, এবং আমাদের মতে শি-মাতৃভাষার পক্ষে অপমানজনক সম্পর্ক থেকে বেরোবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। আমাদের ভাবা উচিত ছিল, শি-মাতৃভাষার স্থান —এর অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে রেখে না দিয়ে তাকে আরও এক, উচ্চস্তরের শিক্ষায়, এমনকি গবেষণা সীমা পর্যন্ত উন্নীত করা যায় কি না, এবং দুই, শিক্ষণীয় সমস্ত বিষয় তার মাধ্যমে শেখানোর প্রকল্পের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়া যায় কি না। কারণ, আমাদের মতে, আমরা দুটি জিনিস প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিচ্ছি, এক, পাশ্চাত্যের কাছে আমরা জ্ঞানের দিক থেকে চিরকাল অধমর্ণ থেকেই যাব, এবং দুই, আমাদের ভাষাও জ্ঞান ও বিদ্যার আশ্রয় হিসেবে চিরকাল দরিদ্র থেকে যাবে। অন্তত এ থেকে যে অন্যরকম কিছু হতে পারে, তা ভাববার সাহস এই শিক্ষানীতি প্রণেতারা দেখাতে চাননি বা পারেননি। আমরা যদি তা করতে যাই, 'হঠকারী' বলা ছাড়াও যে প্রশ্নগুলি উঠবে তা আমরা অনুমান করতে পারি, কিন্তু, প্রশ্নগুলির ঝুঁকি নিয়েও আমাদের প্রস্তাব, শিক্ষার সর্বস্তর পর্যন্ত শি-মাতৃভাষাকে মাধ্যম করা হোক এবং সমস্ত শিক্ষণীয় বিষয়ে তাকে মাধ্যমরূপে বিস্তারিত করা হোক। ভারতের যে কেন্দ্রীয় সরকার কথায় কথায় দেশপ্রেমের কথা বলে, তাদের দেশপ্রেম হিন্দি ছাড়া আর কোনও ভাষাপ্রেমে বিস্তারিত হয় না কেন জানি না। যাই হোক, আমাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ ও প্রশ্নের উত্তর আমরা একে একে দেব। তার আগে অনিবার্যভাবে রবীন্দ্রনাথের একটি পরিচিত উদ্ধৃতি তুলি —

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়া কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে ? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল ? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতায় শূদ্র ? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না ? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া

তবেই কি আমরা দ্বিজ হই ? (ঠাকুর, ১৩২২/১৯৯০, রর, ত্রয়োদশ, পৃ. ৫৪৪)।

শি-মাতৃভাষার মাধ্যম যে গুরুত্বপূর্ণ তার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য আমরা ভারতে (অবিভক্ত এবং বিভক্ত) সাক্ষরতার পরিসংখ্যান থেকে উদ্ধৃত করতে পারি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতে মেকলের শিক্ষানীতি (১৮৩৫) ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা (১৮৫৭) পার হয়ে যখন ভারতে জনগণনা শুরু হল, তার পরের ইতিহাসকে আমরা ইংরেজি মাধ্যম পর্ব ও শি-মাতৃভাষা মাধ্যম পর্ব এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। তার আগে এই জনগণনা শুরুর পর্বে, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আক্ষেপ আমরা লক্ষ করি তাঁর বঙ্গদর্শন পত্রিকার পত্র-সূচনায়, সম্পাদকীয় প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র মেকলে-অনুবর্তীদের পাতন-তত্ত্ব বা ফিল্‌টার ডাউন তত্ত্বের উপযোগিতা বেশ কিছু ইংরেজ এবং কয়েকজন বাঙালির মতোই বিশ্বাস করেননি, তিনি জানতেন যে, উচ্চশিক্ষিত যাঁরা হবেন তাঁরাই আবার দেশের দরিদ্র নিরক্ষরদের শিক্ষার কাজে এগিয়ে আসবেন এই অনুমান যথার্থ হবে না, কারণ, তাঁর কথায়, "এক্ষণে আমাদিগের ভিতরে উচ্চ শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পর সহৃদয়তা বিন্দুমাত্র নাই। উচ্চ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোকেরা, মূর্খ দরিদ্র লোকদিগের কোন দুঃখে দুঃখী নহেন। মূর্খ দরিদ্রেরা, ধনবান এবং কৃতবিদ্যদের কোন সুখে সুখী নহেন।" (বাগল, স., ১৩৬১ : ২৬২)। এর কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন, 'ভাষাভেদ' (২৮৩), অর্থাৎ এক শ্রেণি ইংরজি জানে, অন্য শ্রেণি ইংরেজি জানে না, আধুনিক ইংরেজি বয়ানে যাকে language divide বলা যায়। এই বিভাজন আবার সাক্ষর ও নিরক্ষরেরও বিভাজনের সমান্তরাল, নীচের সাক্ষরতার ক্রমান্বয়ী তালিকা তার সাক্ষ্য তুলে ধরবে।

ইংরেজি মাধ্যম পর্ব	
১৮৭২	৩.৭৫
১৮৮১	৪.৩২
১৮৯১	৪.৬২
১৯০১	৫.৪
১৯১১	৫.৯
১৯২১	৭.২
১৯৩১	৯.৫
২০১১	৭৪.৪
২০২০ (নমুনা সমীক্ষা)	৭৭.০৪

শি-মাতৃভাষা মাধ্যম পর্ব	
১৯৪১	১৬.১
১৯৫১	১৮.৩৩
১৯৬১	২৮.৩
১৯৭১	৩৪.৪৫
১৯৮১	৪৩.৮৭
১৯৯১	৫৩.২১
২০০১	৬৪.৮৩

আমি একটিমাত্র চলমাত্রা (variable) শি-মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের সুযোগকে গ্রহণ করেছি এই পরিসংখ্যানকে ব্যাখ্যার জন্য, তা অনেকের কাছে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। কিন্তু এটা একটা ঘটনা যে ১৯২৯ সালে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দিয়ে শুরু করে ১৯৪০এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শি-মাতৃভাষায় এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়া শুরু হয়, এবং তার ইতিবাচক প্রতিফলন অবিভক্ত ও পরে বিভক্ত ভারতের সাক্ষরতা-চিত্রে দেখা যায়। ১৮৭২ থেকে ১৯৩১ পর্যন্ত যেখানে সাক্ষরতা ১ থেকে বড় জোর ২ শতাংশ হারে বেড়েছে সেখানে ১৯৪১ থেকে দু-এক দশকের ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় ৮ থেকে ১০ শতাংশ বা তারও বেশি হারে বেড়েছে। নিশ্চয় স্বাধীনতার পর ভারতে স্কুলের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে, শি-মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ থাকায় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাও বেড়েছে, হয়তো বয়স্ক সাক্ষরতার বিচ্ছিন্ন প্রয়াসও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।[৮]

আমাদের প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রশ্ন ও তার উত্তর

বলা বাহুল্য উপরের অংশে আমাদের যে প্রস্তাব (আগাগোড়া শি-মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা) সে সম্বন্ধে, তিরস্কার, ধিক্কার, নিন্দোক্তি ইত্যাদি উচ্চারিত হতেই পারে, সেগুলিতে আমরা অভ্যস্ত। কিন্তু আমরা এও জানি যে, তার আড়ালে কিছু সংগত প্রশ্ন থাকবে। আমাদের কর্তব্য এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া। আমরা যে প্রশ্নগুলি অনুমান করতে পারছি সেগুলির উত্তর একে একে দিচ্ছি। সেই সূত্রে আমাদের প্রস্তাবটির ব্যাখ্যা ও বিস্তার ঘটবে। এর বাইরে যদি কোনও ত্রুটির কথা কারও মনে হয়, তাও জানানোর জন্য আমাদের বিনীত আমন্ত্রণ রইল।

প্রশ্ন এক : মাতৃভাষায় সর্বশিক্ষা মানে কি ইংরেজি বিতাড়ন ?

এই প্রশ্নটাই যেহেতু মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ততামুখী সমস্ত অভিভাবকের মনে ‘মাতৃভাষা’ শিক্ষা কথাটি উচ্চারিত হওয়া মাত্র ছুটে আসে, তারই উত্তর আমরা আগে দেব। না, ইংরেজি ভাষা থাকবে। দরকার ছিল না, তবু একে বারে প্রথম শ্রেণি থেকে ইংরেজি ভাষা বলা ও লেখাপড়ার দক্ষতা শেখানো চলবে, কিন্তু মাধ্যম হিসেবে নয়। ছেলেমেয়েরা বিষয়গুলি পড়বে নিজেদের শি-মাতৃভাষায়। কিন্তু যাতে তারা ভালোভাবে ইংরেজিতে দক্ষ হয়ে ওঠে, তার জন্য প্রথম থেকেই উদ্যোগ নিতে হবে। এবং শুধু লেখাপড়ার ভাষা হিসেবে নয়, বলার ভাষা হিসেবেও। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি পশ্চিম দেশে এম এ ও পিএইচডি ডিগ্রির জন্য একাধিক ভাষা জানতে হয় library language হিসেবে, অর্থাৎ পড়ার বা পড়ে বোঝবার দক্ষতা অর্জনের জন্য, যাতে গবেষণায় উল্লেখ

(refer) করা যায়। আমরা এই উপমহাদেশের ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইংরেজির সেই পঠনদক্ষতা শুধু চাইছি না। একটি ভাষাকে সমর্থভাবে দখল করার জন্য যে দক্ষতাগুলি দরকার, পড়া, লেখা, বলা, (বোধ তো তারই অঙ্গ) তার সবগুলিই অর্জিত হয় এমন ইংরেজি শিক্ষা চাইছি, যাতে সে স্কুলের অন্তত উঁচু ক্লাসে ইংরেজি সহায়ক বইও পড়তে পারে। ভয় কাটিয়ে বলতেও শুরু করতে পারে। অর্থাৎ শি-মাতৃভাষার পরেই ইংরেজিকে একটি কার্যকর ভাষা হিসেবে উপমহাদেশের শিক্ষানীতিতে গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু, আবার বলি, পড়ার, শিক্ষার, মূল মাধ্যম হবে শি-মাতৃভাষা।

আগে সমস্যা ছিল যথেষ্ট সংখ্যক যোগ্য শিক্ষক পাওয়া যাবে কি না যাঁরা এই সমস্ত দক্ষতা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সঞ্চার করতে পারবেন। আমার ধারণা, এই যোগ্য শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ছে। তাঁরা সকলে ভাষাশিক্ষণে দক্ষ নাও হতে পারেন, অনেকেই নিছক সাহিত্যের ছাত্র। তাঁদের ভাষাশিক্ষণের প্রশিক্ষণ দিতে হবে। আর তা ছাড়া প্রযুক্তির সাহায্যে ভিডিয়ো, ইউটিউব, আরও নানা শ্রুতি-উপকরণ এখন গ্রামের স্কুলগুলিতেও পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, স্মার্ট ফোন ইত্যাদি তো আছেই। যেখানে অভাব আছে সেখানে রাষ্ট্রকে সেই অভাব পূরণের দায়িত্ব নিতে হবে।

উলটোদিকে এ প্রশ্নও উঠতে পারে যে, অন্য ভাষার তুলনায় ইংরেজির এত গুরুত্ব কেন ? আমরা গুগ্‌ল-সন্ধান করে দেখেছি, যে সব দেশে মাতৃভাষায় শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়, তাতে বড় দেশ চিন, জাপান, রাশিয়া থেকে ছোটো গ্রিস, ভিয়েতনাম প্রভৃতি অজস্র দেশ আছে সেখানে ইংরেজির এত গুরুত্ব নেই। তবে আমরা এত গুরুত্ব দেব কেন ?

দেব এই জন্য যে, চাই আর না চাই, ইংরেজি এ উপমহাদেশের করপোরেট বাণিজ্যের ভাষা, অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা, বহুভাষী ভারতে এখনও আন্তঃপ্রাদেশিক সংলাপ ও যোগাযোগের ভাষা, বিশেষত উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে। বাংলাদেশ একভাষী, কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ার কারণে বিদেশের সঙ্গে তার যোগাযোগ অনেক বেশি, তার নাগরিকেরাও অনেক বেশি বিদেশমুখী। ফলে ইংরেজি তাঁদেরও দরকার। সাহেব হওয়ার জন্য ততটা নয়, জীবিকা ও শিক্ষার জন্য।

যখন পশ্চিমবঙ্গের একটি সরকার ক্লাস সিক্স থেকে ইংরেজি পড়ানোর সূত্রপাত করে তখন কিছুদিন ধরে একটি প্রশ্ন অনেক বাঙালির মনে অতিরঞ্জিত রূপ নেয়, 'ইংরেজি শিক্ষা কি বাতিল করতে হবে?' ইত্যাদি বাক্যবন্ধে। এই বাঙালিদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় বুধজনেরাও ছিলেন (দ্র. বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯১)।

বলা বাহুল্য, ইংরেজি শিক্ষা 'বাতিল' করার প্রশ্ন তখনও ওঠেনি, এখনও উঠছে না। কিন্তু অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ওই বক্তৃতায়[৯] একটি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছিলেন, সেটি অবহেলাযোগ্য নয়। তিনি বলেছিলেন,

...গবেষণার কী হবে ? কেউ যদি বাংলা ভাষায় রসায়ন, পদার্থতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, জ্যোতির্বিজ্ঞান দিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রির জন্য গবেষণা করেন, তার পরীক্ষক তো শুধু বাঙালিই হবেন। ফলে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা গুটি কয়েক ব্যক্তির কুক্ষিগত হয়ে পড়বে এবং অজস্র দুর্নীতি শিক্ষাকে হাস্যকর করে তুলবে। (বরুণ ও সত্যবতী, ২০০৮ : ২৪৬)

এই কথাগুলি ফেলে দেওয়ার মতো নয়, যদিও এগুলিতে বাঙালি বিদ্বজ্জনের বিদ্যায়তনিক এবং নৈতিক সততা সম্বন্ধে অবিশ্বাস আছে। মনে রাখতে হবে, বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাশ্চাত্যের প্রধান-প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার ডিগ্রি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের, অনেক সময় সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপকেরাই পরীক্ষা করেন। তা বাইরে কদাচিৎ পাঠানো হয়। তা নিয়ে সততা বিষয়ে কোনও সংশয় প্রকাশ করা হয় না। দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে তা হয়, হওয়ার কারণও আছে।

এ ক্ষেত্রে আমাদের মন্তব্য, গবেষকের কাছে গবেষকের গবেষণার ভাষা নির্বাচনের বিকল্প থাকবে, বা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার বস্তু অনুযায়ে তাঁকে নির্দেশ দেবেন তাঁকে ইংরেজি না শি-মাতৃভাষায় গবেষণাপত্র পেশ করতে হবে। গবেষণার শুরুতে এই নির্দেশ দেওয়া হলে গবেষকেরও সুবিধা হবে প্রস্তুত হওয়ার। আমরা চাই যে, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির পর গবেষক শি-মাতৃভাষা এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতেই গবেষণা করার দক্ষতা অর্জন করবেন।

প্রশ্ন দুই : ভারতের মতো বহুভাষী দেশে সব মাতৃভাষাকে এমনভাবে প্রস্তুত করা যাবে কি ?

ভারতে মাতৃভাষা নানান আকারের আছে। যেগুলি খুব ছোট, ধরা যাক পঁচিশ হাজারের কম মানুষ বলেন, এবং এই মানুষেরা এক জায়গায় সংহত নন, নানা অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকেন, তাঁদের ভাষাকে শি-মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহারের সমস্যা আছে। কিন্তু ভারতেই সংবিধানের অষ্টম তপশিলের বাইশটি ভাষার ক্ষেত্রে এই সমস্যা অপেক্ষাকৃত কম, যদিও সাঁওতালি জনগোষ্ঠী কিছুটা পরিকীর্ণ, কিন্তু অন্তত ঝাড়খণ্ডে বিহারে পশ্চিম বাংলায় তাঁদের সংহত অবস্থান আছে। সকলের সমৃদ্ধি এক রকমের নয়, কিন্তু সকলেরই লিপি আছে, মূল্যবান ও জনপ্রিয় সাহিত্য আছে, ফলে পাঠ্য বই

প্রণয়নে এই ভাষাগুলির সামর্থ্য নিয়ে কোনও প্রশ্ন উঠতে পারে না। মৌলিক সাহিত্যের পাশাপাশি অনুবাদকেও পাঠ্যবইয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। সমাজভাষাবিজ্ঞানে যাকে ভাষাপ্রমিতকরণ বা language standardization বলে তার প্রকল্প এই ভাষাগুলিতে এগিয়ে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হবে। ব্যাকরণ রচনা, অভিধান রচনা, পরিভাষা নির্মাণ ইত্যাদি কাজ এগুলিতে শুরু হয়েছে অনেক আগে থেকেই।[১০] ভারতে নানা ভাষায় রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ গঠিত হয়েছিল গত শতাব্দীর সত্তরের বছরগুলির শেষদিকে, যতদূর মনে হয় ভারতের শিক্ষা কমিশনের নির্দেশ মেনে। পশ্চিম বাংলায় স্নাতক সাম্মানিক স্তর পর্যন্ত বিজ্ঞানেরও বেশ ভালো পাঠ্য বই প্রকাশ করেছিল তারা। কিন্তু এখন সর্বত্রই ভারতে এই কাজে কিছুটা শ্লথতা এসেছে মনে হয়। বাংলাদেশ এই কাজে ভারতের চেয়ে এগিয়ে ছিল বলে আমাদের ধারণা।

এটা স্বাভাবিক যে, উঁচুর দিকে শি-মাতৃভাষায় পাঠ্যবই ব্যবহার করা শুরু হলেই এ বিষয়ে নতুন উদ্যম শুরু হবে, বিশ্ববিদ্যালয় ও বেসরকারি প্রকাশকেরা আবার উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসবেন। এখানেও রবীন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করা যেতে পারে।

শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তাহার কেয়ারি করিবে, কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে-ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কন্টকিত হইয়া উঠিবে। ...বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ যে বাহির হইতেছে না, এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ অঙ্গের শিক্ষার প্রচলন করা। (ঠাকুর, ১৩২২ : ৫৪৬)।

বলা বাহুল্য, কথাটা বলতে যত সহজ, কাজটা তত সহজ নয়। পাঠ্য বইয়ের ভাষা নিয়েও যথেষ্ট ভাবনাচিন্তার প্রয়োজন আছে। আমরা জানি আগে পাঠ্যবইয়ের ভাষার মধ্যে একটা আধিপত্যের ভাব ছিল, সাধুভাষা সেটাকে আরও দূরবর্তী করে তুলত। কিন্তু সাধুভাষার বদলে চলিত ভাষার বিকল্পন হলেই ভাষা সহজ হবে তার কোনও অর্থ নেই। অনেক সময় অনেক লেখকের বাংলা চলিত ভাষায় লেখা পাঠও ইংরেজির চেয়ে কঠিন মনে হতে পারে। তাই পাঠ্যগ্রন্থ প্রণেতাদের লক্ষ্য হবে সহজ মুখের ভাষায়, মূলত ছাত্রদের 'সেল্‌ফ লার্নিং' বা স্বশিক্ষার সহায়ক হয় এমন ভাষায় বইগুলি লেখা। দরকার হলে শিক্ষাকর্তারা এ নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয়, অকাদেমি, একাডেমি, এমনকি বেসরকারি প্রকাশকেরাও এ বিষয়ে উদ্যোগ এবং সহযোগিতায় অগ্রসর হতে পারে।

আমাদের দেশে, সমস্ত ভাষাতেই পণ্ডিত অধ্যাপকের অভাব নেই, ভালো অনুবাদকেরও অভাব নেই। ইংরেজি বা বিদেশি পাঠ্যগ্রন্থের ভাষাও অনেকদিন থেকে

সহজ হয়ে আসছে। সে সব বইকে নানাভাবে সুসজ্জিত ও চিত্তাকর্ষক করার প্রযুক্তিও ক্রমশ সুলভ হচ্ছে। ফলে বিদেশি পাঠ্যগ্রন্থের অনুবাদও নতুন পাঠ্যবই লেখার পাশাপাশি চলতেই পারে।

উপরে আমরা পাঠ্যবইয়ের কথাই বেশি করে বলেছি। কিন্তু যেন মনে রাখি যে, শি-মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান অর্থ হল, এক. ক্লাসঘরে শিক্ষক শি-মাতৃভাষা বলবেন, ছাত্রছাত্রী সেই একই ভাষায় তাঁর সঙ্গে আদান-প্রদান করবে ; দুই. পাঠ্যবই, সেই সঙ্গে সহায়ক বইয়ের বেশ কিছু তারা শি-মাতৃভাষায় পাবে। তিন. তারা সব রকম পরীক্ষা দেবে বা পাঠবিষয়ক লেখালিখির কাজ করবে শি-মাতৃভাষায়। এমনকি গবেষণাও, প্রত্যাশিতভাবেই, করবে শি-মাতৃভাষায়। এ বিষয়ে যে সমস্যা আছে তা আমরা আলোচনা করেছি। বলা বাহুল্য, স্কুলেই উপরের দিকে তারা ইংরেজি সহায়ক বই পড়তে পারে এ রকম ইংরেজির দক্ষতা তারা যাতে পায় তাও দেখতে হবে।

প্রশ্ন তিন : ছাত্র অন্য কোনও ভাষা শিখবে না ?

নিশ্চয় শিখবে। স্কুল পর্যায়ে রাষ্ট্র ঠিক করুক আর (একটিমাত্র) কোনভাষা ছাত্রের শিক্ষা দরকার, বিকল্প রেখে। যদি সংস্কৃত/আরবি/ফারসি হয় তা হলে অঞ্চল বা বিদ্যালয়ের পশ্চাদ্‌ভূমি অনুসারে তার ব্যবস্থা রাষ্ট্র করুক। স্কুল পর্যায়ে আমরা তিনটি ভাষার বেশি শেখানোর কথা ভাবি না, যদিও ভারতীয় শিক্ষানীতির প্রণেতারা পাঁচটি ভাষা শেখানোর কথা ভেবেছেন। আমাদের মনে রাখা দরকার, ভাষা মানুষ শেখে প্রয়োজনে। এবং কাজ, লেখাপড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে যদি প্রয়োগ না থাকে শখ করে শেখা ভাষা মানুষ দুদিনে ভুলে যায়। ভারতের ১৯৬৮’র ত্রিভাষা সূত্র বিশেষ কোনও সুফল প্রসব করতে পারেনি। কেন্দ্রীয় ভারতীয় ভাষা সংস্থান স্কুল শিক্ষকদের প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষা শেখানোর যে আয়োজন করেছিল, তার বিষয়েও আর বিশেষ কিছু শোনা যায় না। মনে হয় রাষ্ট্রেরই উচিত অনলাইনে এ সব ভাষা শেখানোর ব্যবস্থা করা, স্কুলের প্রকল্পের বাইরে। বিশ্ববিদ্যালয়, নানা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন কনস্যুলেট, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান ভাষা শেখানোর নানা আয়োজন করে। কলকাতা বা ঢাকার বাইরেও সেই সুযোগ বিস্তারিত হওয়া দরকার এ বিষয়ে রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি দায়িত্ব আছে। আমাদের মতে স্কুলের গণ্ডি পার হলে স্বাধীনভাবে নিজের তাগিদে ভাষা শিক্ষার বিস্তারিত সুযোগ থাকা দরকার। এখন অবশ্য ইউটিউবেও এই সুযোগ আছে, যা আগে ছিল না।

উপসংহার

এই প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথ থেকে একটু সরে যাওয়ার উচ্চাশা পোষণ করেছে। তা হল, রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের "মোড়টার কাছে" "ইংরেজি বাংলা দুটো বড়ো রাস্তা" খুলে দেওয়ার ব্যবস্থা থাক। আমরা বলি যে, না, সমস্ত শিক্ষা হোক মাতৃভাষায়, কিন্তু ইংরেজিও দক্ষিণ এশীয় ছাত্রছাত্রী শিখুক ভালো করে, তার বলা, পড়া ও লেখার দক্ষতা তাকে এই ভাষায় আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে তুলুক। এটা সম্ভবত বলার প্রয়োজন নেই যে, মুখস্থবিদ্যা নয়, বোধ ও গ্রহণের মধ্য দিয়ে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রকৃত শিক্ষা আমাদের কাঙ্ক্ষিত, এবং তারই ভিত্তিতে ভাষাগোষ্ঠী নিজের প্রতিষ্ঠাভূমি যেমন শক্ত করবে তেমনই একটি আন্তর্জাতিক ভাষাকে অবলম্বন করে নিজের চারণক্ষেত্রকেও সারা পৃথিবীতে বিস্তারিত করবে।

টীকা

১ একটি ভাষা তখনই শিক্ষার যথার্থ বাহন হয়ে ওঠে যখন ক্লাসে সেই ভাষায় পড়ানো হয়, সেই ভাষায় পাঠ্যপুস্তক ছাত্রছাত্রীদের হাতে থাকে, সহায়ক গ্রন্থও পাওয়া যায়, পরীক্ষাও সেই ভাষায় দেওয়া যায়। মানবিক বিদ্যার স্তরেও সেটা কোনক্ষেত্রে কতটা ঘটছে সে নিয়ে কোনও সমীক্ষা হয়েছে কি না আমি জানি না।

এখানে আগেই বলে রাখি যে, পরেও যেমন বলব, ছাত্রছাত্রীরা, বিশেষ করে স্কুলের উঁচু ক্লাস থেকে শেষ পর্যন্ত, শুধু এক ভাষার বই পড়বে মাতৃভাষা বাহনের নামে এ ধরনের কোনও শিক্ষানীতির প্রচার আমাদের লক্ষ্য নয়।

২ গত ২২ ফেব্রুয়ারি (২০২১) তারিখে ঢাকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রে এই নিবন্ধের একটি ইংরেজি প্রাগরূপ পঠিত ও আলোচিত হয়েছিল। বাংলাদেশের মাননীয়া শিক্ষামন্ত্রী শ্রীমতী দীপু মণি তাতে সভাপতিত্ব করেন। প্রবন্ধটির নাম ছিল 'Can We Give Our-Mother Tongue a Chance?' এ প্রবন্ধটি তার অনুবাদ নয়, আমূল পুনর্লিখিত একটি রূপ।

৩ পশ্চিমবঙ্গে প্রায়ই সরকার ঘোষণা করেন যে, আরও ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল স্থাপন করবেন বা বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিকে ইংরেজি মাধ্যমে রূপান্তরিত করা হবে। তাতে একটু শঙ্কিত থাকি।

৪ আমরা জানি এটি একটি বিতর্কিত ধারণা। তবু শিশুর জন্ম থেকে কৈশোরের আগে শুনে এবং বলে (মৌখিক) ভাষাশিক্ষার যে অনায়াস-দক্ষতা তার কোনও বিকল্প কোনও তত্ত্ব বা ব্যাখ্যা এখনও বিজ্ঞান হাজির করতে পারেনি। তাই আমরা এটিকে পরিত্যাগ করছি না।

৫ আঞ্চলিক উপভাষা যে পরস্পর বোধগম্য হবেই তা নয়। পাশাপাশি গোষ্ঠীভাষাগুলির মধ্যে বোধগম্যতা থাকে, এমনকি ভিন্ন ভাষা বা অন্য গোত্রের নিঃসম্পর্কিত পাশাপাশি ভাষার

মধ্যেও তা থাকে। দক্ষিণ-পশ্চিম মেদিনীপুরে বাংলা ও ওড়িয়ার মধ্যে যেমন পরস্পর অনুবিদ্ধতা আছে, তেমনই অন্ধ্র আর ওড়িশার সীমান্তে ওড়িয়া তেলুগুর মধ্যে বোধগম্যতা না থাক, এক ধরনের দ্বিভাষিকতা আছে, যেমন আছে চট্টগ্রামের পূর্বসীমান্তের বাংলা ও মগদের ভাষার সঙ্গে। তবে কোন উপভাষা একটা ভাষার সদস্য হবে ? এর উত্তর প্রশাসনিক রাজনৈতিক ভিত্তির উপর তৈরি হয়। অর্থাৎ মেদিনীপুরের কাঁথি-দীঘা আর ওড়িশার মৌখিক ভাষা প্রায় অভিন্ন হলেও পশ্চিম বাংলার মানচিত্রের অধিবাসীরা বলবেন তাঁরা বাঙালি ও বাংলাভাষী, আর ওড়িশার মানচিত্রের অধীন মানুষেরা বলবেন তাঁরা ওড়িয়া। ভাষা অভিন্ন হলেও। নিশ্চয় বাংলাদেশের সীমান্তেও এমন ঘটনা ঘটে।

৬ অভিবাসীদের স্থানীয় ভাষা শিক্ষা উচিতই, সে দিক থেকে এর সঙ্গে আমাদের কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু প্রযুক্তি ব্যবহারের এই যুগে ওই অভিবাসী ছাত্রছাত্রীদের তাদের নিজদের অঞ্চলের কোনও স্কুল থেকে অনলাইনে তাদের নিজেদের ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায় কি না সে কথাটাও নীতিপ্রণেতাদের ভাবা উচিত ছিল। সে ক্ষেত্রে, আমাদের মতে, স্থানীয় ভাষাকে মৌখিক ভাবে শিখলেই হয়, লেখাপড়ার ভাষা 'মাতৃভাষাই' হতে পারে। আমাদের প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশের বক্তব্যের সঙ্গে এই কথার সংগতি আছে। অর্থাৎ কোনও নির্দিষ্ট ভাষার ছাত্র, নিজের ভাষা-অঞ্চলের বাইরে পৃথিবীর যে কোনও প্রান্তে থাকুক না কেন, অনলাইন প্রযুক্তির সাহায্যে নিজের ভাষাক্ষেত্রের কোনও স্কুলের ছাত্র হতে পারে কি না সে সম্ভাবনা যাচাই করতে হবে। এখন যেমন বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে দূরশিক্ষণ বা distance learning–এর সুযোগ আছে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে সে হয়তো বিদেশি ডিগ্রিই চাইবে, তখন অন্য কথা।

৭ ভাবার কারণটিও স্পষ্ট। কলকাতা শহরের বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বহুলভাবে হ্রাস পেয়েছে, করপোরেশনের প্রাথমিক স্কুলগুলিতেও। ওই মধ্যবিত্ত আর মধ্যবিত্ততা-অভিমুখী অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের আর বাংলা মাধ্যম স্কুলে পড়াতে চান না। যত টাকাই লাগুক, তাঁদের ইংরেজি মাধ্যম চাই, ফলে সরকারও চাপের মধ্যে থাকে।

৮ অবশ্যই ১৯৮৮তে ইউনেস্কোর অনুদান আসার ফলে ভারতে জাতীয় সাক্ষরতা মিশন গড়ে ওঠে এবং রাজ্যে রাজ্যে বয়স্ক সাক্ষরতার বিপুল কার্যক্রম শুরু হয়। তার আগেকার চেষ্টাগুলি তেমন সংহতও ছিল না। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের বছরগুলিতে এই প্রয়াসে উৎসাহ ছিল, এখন তাতে একটু মন্দা এসেছে বলে মনে হয়। দুঃখের বিষয় পূর্বপাকিস্তান ও বাংলাদেশের কোনও এ জাতীয় পরিসংখ্যান আমি সংগ্রহ করতে পারিনি।

৯ পরিভাষা প্রয়োগ আর নীতি সম্বন্ধে বাংলায় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে লেখালিখি হয়ে আসছে। ঢাকার বাংলা একাডেমিও এক সময় প্রচুর কাজ করেছে, বেসরকারি প্রকাশকেরা এবং পাঠ্যপুস্তক লেখকরাও নিজেদের সাধ্য ও জ্ঞানবুদ্ধিমতো পরিভাষা নির্মাণ করেছেন। তার তালিকা করার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের মতে পরিভাষানীতির মূল ভিত্তি হওয়া উচিত এইগুলি এক.সেগুলি মোটামুটিভাবে স্বচ্ছ (পড়লে অর্থ পরিষ্কার হয়) ও সুবোধ্য কি না ; দুই. সুশ্রাব্য ও ব্যাকরণগত ভাবে নমনীয় কি না অর্থাৎ সেগুলি বিশেষ্য হলে সহজে বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি করা যাবে কি না ; তিন. সেগুলি অতিরিক্ত দীর্ঘ কি না অনেক সময় সংস্কৃত ভাষার উপর নির্ভর করলে পরিভাষা মূলের চেয়ে দীর্ঘ হয়। চার. ভাষার ব্যাপারে আমাদের

বঙ্কিমচন্দ্রের নীতি যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় (তিনি তখন নতুন উদ্ভাবিত 'বিজ্ঞাপন' কথাটির বদলে 'ইশতেহার' কথাটি পছন্দ করেছিলেন (বাগল, ১৩৬১ : ১৩৫)। তবে এখন 'বিজ্ঞাপন' অন্য অর্থে প্রচলিত হয়েছে। এমনকি মূল ভাষার পরিভাষাও রেখে দেওয়া চলে। তবে ইদানীং ইংরেজিতেও গ্রিক-লাতিন শব্দের বদলে ইংরেজি শব্দের ব্যবহারের প্রবণতাটি লক্ষ করতে বলি-geology -র বদলে earth sciences– biology -র বদলে life sciences ইত্যাদি।

উৎসনির্দেশ

চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। দ্র. বাগল যোগেশচন্দ্র(১৩৬১)। দাশগুপ্ত, রবীন্দ্রকুমার ও অন্যান্য [সম্পা.], ১৯৯০। রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড। পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা। —, ১৯৯। রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ সরকার। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, "ইংরেজি শিক্ষা কি বাতিল করতে হবে?" দ্র. বরুণকুমার চক্রবর্তী ও সত্যবতী গিরি (সম্পা.)। ২০০৮। পৃ. ২৪৫-৪৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্দীপ [সম্পা.] (১৯৯৩)। বাঙালির ভাষাচিন্তা সমাজভাষা। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা। বর্মণ, ড. রমেন্দ্র (১৯৯৯)। মাতৃভাষা চিন্তা প্রসঙ্গ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। পুনশ্চ, কলকাতা। বাগল, যোগেশচন্দ্র [সম্পা.] (১৩৬১)। বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড। সাহিত্য সংসদ, কলকাতা। সরকার, পবিত্র, ২০০৩। 'বাংলাভাষা, পূর্বপাকিস্তান, বাংলাদেশ' দ্র. সরকার, পবিত্র, ২০০৩, ২৪-৭৪। —,২০০৩। ভাষাপ্রেম, ভাষাবিরোধ। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা। —, 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা : রবীন্দ্রচিন্তার মানচিত্র', দ্র. সরকার, পবিত্র, ২০০৫, পৃ. ৪৩-৬৫। —, 'মাতৃভাষা ও শিক্ষা : আদর্শ ও বাস্তব', দ্র. সরকার, পবিত্র, ২০০৫, পৃ. ১৬০-১৭৯। —, ২০০৫/১৯৮৪। ভাষা দেশ কাল, দ্বিতীয় সং। মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

Burchfield– Robert Sed.V– 1994– The Cambridge History of English Language– Vol. V– Cambridge– Cambridge University Press. Department of Human Resource Development– Government of India– 2019– Draft National Education Policy– 2019– New Delhi– Government of India.– 2020– National Education Policy– New Delhi– Government of India. Fishman– J.– 1997– In Praise of Beloved Language– The Hague– Mouton. Kachru– B. B.– 1994– English in South Asia– in Burchfield– 1994– pp. 497-553. Sarkar– Pabitra– 1998– Report of the One-Man Committee on English at Primary Education in West Bengal– Calcutta– Department of Primary Education– Government of West Bengal.–2021– Can We Give Our Mother Tongue a Chance?' ঢাকার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্‌স্টিটিউটে ২২ ফেব্রুয়ারির আলোচনাচক্রে পঠিত মূল প্রবন্ধ।

পরিচিতি ঃ পবিত্র সরকার

১৯৩৭এর ২৮শে মার্চ বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার সাভারের কাছে বলিয়ারপুর গ্রামে পবিত্র সরকারের জন্ম। স্কুলের গণ্ডি পার করে স্কটিশচার্চ কলেজে অর্থনীতির সাম্মানিক পাঠক্রমে তিনি ভর্তি হয়েছিলেন। একবছর বাদে বাংলার সাম্মানিক পাঠক্রমে পুনরায় ভর্তি হন বঙ্গবাসী কলেজে। ১৯৫৯সালে সাম্মানিক বাংলা পরীক্ষায় দ্বিতীয় শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর বাংলা পড়তে আসেন। ১৯৬১তে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় (সেবারে এটাই ছিল একমাত্র প্রথম শ্রেণি)। অল্প কিছুদিন স্কুলের শিক্ষকতার পর ১৯৬২সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনার কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৩তে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাষক হিসাবে যোগ দেন।

এই কর্মজীবনের অভিমুখ বদলে যায় সত্তর দশকের শেষ দিকে। ১৯৬৭ সালে আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত ভাষাবিজ্ঞানের 'সামার কোর্স' এবং পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে এম এস ইউনিভার্সিটি, বরোদায় ভাষাবিজ্ঞানের অ্যাডভান্স কোর্স নেন তিনি। এরপর ১৯৬৯ সালে ফুলব্রাইট স্কলারশিপ নিয়ে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাবিজ্ঞানে উচ্চতর পাঠের জন্য যান তিনি। ভাষাবিজ্ঞানে পি.এইচ.ডি. প্রোগ্রামের মধ্যেই মিনেসোটা, শিকাগো ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন শিক্ষকতা করেন। ১৯৭৫-এ দেশে ফিরে এসে ১৯৭৬-এ যোগ দেন তাঁর পুরোনো কর্মক্ষেত্র যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে।

১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার পর তিনি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৯৯০-এর ৩১-শে মার্চ। টানা সাত বছর উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করে ১৯৯৭ সালে যোগ দিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা সংসদে সহ-সভাপতি হিসাবে এবং ২০০৩ সালে এখান থেকেই অবসর গ্রহণ করেন অধ্যাপক পবিত্র সরকার।

এরই পাশাপাশি তিনি ১৯৮৬ সাল থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০০৩ থেকে ২০১১ পর্যন্ত ছিলেন সহ-সভাপতি। এছাড়াও একাধিক সারস্বত সংস্থার সঙ্গে তিনি সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকেছেন।

সভাপতি - বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (২০০৩-২০০৮),

সভাপতি - ভারতীয় ভাষা পরিষদ (২০০০-২০০৯),

সভাপতি - নাট্যশোধ সংস্থা (২০০১-২০১০)

১৯৮৩ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত তিনি সাহিত্য অকাদেমির সদস্য ছিলেন, সদস্য ছিলেন সঙ্গীত নাটক অকাদেমিরও (২০০৩-২০০৮)। অধ্যাপক সরকার আমন্ত্রিত বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেছেন বহু সরকারি কমিটিতে, ইউ.জি.সি ও ন্যাক-এ (NAAC), দেশ বিদেশের বহু সারস্বত সংস্থায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে। পশ্চিম বাংলায় প্রাথমিকে ইংরেজি এবং অলচিকি লিপিতে

সাঁওতালি ভাষা কমিটির এবং ত্রিপুরায় উপজাতি ভাষা কমিশনের মত গুরুত্বপূর্ণ কমিশনের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার পালন করেছেন। বর্তমানে সহ-সভাপতি হিসাবে যুক্ত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভাষা-প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদের সঙ্গে (২০১৭ পর্যন্ত)।

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের জীবনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক তাঁর নাট্যচর্চা। অভিনয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আগেই সেই স্কুল জীবনে। কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সে পরিচয় গভীরতর হয়েছিল। নিয়মিত নাটকের অভিনয় করেছেন। নাটকের প্রথাগত শিক্ষা নিয়েছেন দীপেন সেনগুপ্তের কাছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হয়েছে চিত্তরঞ্জন ঘোষের নাটক 'দাও ফিরে সে অরণ্য' (১৯৬০)। শ্রেষ্ঠ পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন। তিনি ১৯৬০-৬৪ কালপর্বে যুক্ত ছিলেন দীপেন সেনগুপ্তের 'অনুকার' দলের সঙ্গে অভিনয়ের সূত্রে যুক্ত ছিলেন। ১৯৬৪-র শেষে ওতপ্রোত হয়েছিলেন নান্দীকারের সঙ্গে। তার আগেই অবশ্য পরিচয় অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে, যে পরিচয়ের সূত্র পরবর্তীকালে তাঁকে প্রাণিত করবে নোবেলজয়ী হ্যারল্ড পিন্টারের (১০.১০.১৯৩০ ২৪.১২.২০০৮) নাটক The Birthday Party-র প্রথম বাংলা অনুবাদ ('৩৩তম জন্মদিবস') করতে; (এই নাটকটি অভিনীত হয়েছিল ১৯৮২ সালে নান্দীমুখের প্রযোজনায়)। এর পরেও বিভিন্ন সময়ে অনুবাদ করেছেন কয়েকটি জাপানি কিয়োগেন (বুসু, শিক্ষিত দস্যুদ্বয়, ভুকু, ছাতা ও ষণ্ড-বিষয়ক), চেখভের একটি 'ফার্স' (পৌষ-ফাগুনের পালা), বেরটোল্ট ব্রেশ্‌টের একাঙ্ক (ইহুদি বউ), স্লাবোমির ম্রোজেকের একাঙ্ক ('অথই সমুদ্রে') ইত্যাদি। ১৯৬৮-র অক্টোবরে ইউনেস্কোর নাটক 'দ্য লেসন' অবলম্বনে 'নীলিমা' নাটকে অধ্যাপকের চরিত্রে তাঁর অভিনয় উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক সরকারের লেখালিখির জগতের পরিসরও অনেক ব্যপক ও বিস্তৃত। তাঁর গ্রন্থসংখ্যা ৮৭টি, সম্পাদিত গ্রন্থের সংখ্যা ৭০। এছাড়া আছে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত অসংখ্য অসংকলিত প্রবন্ধ, ছড়া, গল্প, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি। ইংরেজি বাংলায় তথ্যচিত্রের চিত্রনাট্য লিখেছেন একাধিক, জাতীয় স্তরে তা প্রচারিত এবং চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়েছে। অন্য শিল্পীদের গানের অ্যালবামে ভাষ্য রচনা করেছেন। বিবিধ সৃজনশীল কর্মের মধ্যে জীবনের অফুরান আনন্দকে অনুভব করেছেন তিনি।

বহুমুখী বৌদ্ধিক সৃজনকর্ম ও সাহিত্যকর্মে নিয়োজিত এমন একজন বাঙালির কাজের অভিমুখে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক —বাংলা ভাষা, সেই ভাষায় শিক্ষার সার্থকতা এবং বুনিয়াদী ও উচ্চশিক্ষার স্তরে নিরন্তর বয়ে চলা প্রায়োগিক সমস্যাগুলির চিহ্নিতকরণ। আর বাংলা ব্যাকরণ এমন এক আধুনিক মনস্ক বাঙালি বৈয়াকরণ আজ আমাদের মধ্যে কথা বলবেন যিনি এই মুহূর্তে দুই বাংলার জন-ব্যকরণ পরিসরে এক প্রতিষ্ঠান। সহজ, সহজতর গণচিন্তার অভিমুখী, ব্যবহারিক বাংলা ভাষার চলনকে, তার সামাজিক সমস্যাকে এক সংবেদনশীল মন নিয়ে স্পর্শ করে গেছেন তিনি —ফলত তাঁর ভাবনা থেকে ভাষা ও শিক্ষা পরিকল্পনার বিভিন্ন দিকও উন্মোচিত হয়েছে।